IJCRT.ORG ISSN : 2320-2882

INTERNATIONAL JOURNAL OF CREATIVE RESEARCH THOUGHTS (IJCRT)

An International Open Access, Peer-reviewed, Refereed Journal

বাদল সরকারের উদ্ভট নাটক ‘পাগলাঘোড়া’ : একটি পর্যালোচনা

ঘনশ্যাম রায়

সহকারি অধ্যাপক

বাংলা বিভাগ

ড. মেঘনাদ সাহা কলেজ

রানিপুর, ইটাহার, উত্তরদিনাজপুর, প.ব.

বাদল সরকারের ‘পাগলা ঘোড়া’ (১৯৬৭) নাটকটি বাদল সরকারের একটি জনপ্রিয় নাটক। এই নাটকটি নাট্যকারের মানবিক মূল্যবোধ, বেদনা, অনুভূতি ও অঙ্গীকারের প্রতীক| নাইজেরিয়ায় এনুগু শহরে অবস্থান করার সময় ১৯৬৭ সালের২০শে জানুয়ারি থেকে ২৫শে জানুয়ারির মধ্যে তিনি এই নাটকটি লিখেছিলেন। ‘পাগলা ঘোড়া’ নাটকটি ১৯৬৯ সালে দিল্লিতে প্রথম মঞ্চস্থ করা হয়েছিল| পরবর্তীকালে বহুরূপী নাট্যগোষ্ঠীর প্রযোজনায় কলকাতায় ১৯৭১ সালে এই নাটকটির প্রথম অভিনয় হয়| অত্যন্ত জনপ্রিয়তার কারণে ‘পাগলা ঘোড়া’ নাটকটি সে সময় অনেকগুলি ভারতীয় ভাষায় অনুদিত ও অভিনীত হওয়ার গৌরব লাভ করেছিল|মানুষ তাঁর জীবনের সমস্ত যন্ত্রণা ও অশান্তির কবল থেকে মুক্তি লাভ করতে এবং জীবনে পরমানন্দ পেতে গিয়ে কীভাবে তাঁর বিভিন্ন ঘটনার সম্মুখীন হন--তার প্রকৃষ্ট উদাহরণ হল এই নাটকটি|‘পাগলা ঘোড়া’ নাটকে আছে জীবনের অর্থহীনতার কথা। তাই কার্তিকের মনে হয়েছে যে, এ জীবনে মানুষ যা কিছু করে তা সবই এক ধরনের ভুল। এই নাটকে দেখা যায় বিভিন্ন বৃত্তির চারজন মানুষ একটি মেয়ের অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া চালানোর পাশাপাশি কিছু পানীয় গ্রহণ করছিলেন এবং তাঁদের জীবনে ব্যর্থ প্রেমের বেদনার ইতিহাস তুলে ধরছিলেন। জীবনের সত্যিকারের ভালোবাসাকে অবহেলা করে দূরে ঠেলে দিয়ে অল্প বয়সের মেয়ে মানুষের সঙ্গে মনের খামখেয়ালিপনার কথা এই নাটকটির মাধ্যমে ফুটে উঠেছে; পাগলা ঘোড়া তাঁদের অস্থির জীবনের কথা তুলে ধরেছে।‘পাগলা ঘোড়া’ নাটকটিতে তিনজন নারী চরিত্র আছেন; এঁরা হলেন--মালতী, মিলি ও লক্ষ্মী| নাটকের এই তিনজন নারীই আত্মহত্যা করেছেন|

বাদল সরকার এই নাটকটিতে প্রায় দশবছর দীর্ঘ এক সময়ের ইতিহাসকে মাত্র একটি রাতের গল্পের মাধ্যমে তুলে ধরেছেন। এই নাটকের পুরুষ চরিত্রগুলি হলেন কার্তিক, শশী, সাতু ও হিমাদ্রি এবং এঁদের পাশাপাশি নারী চরিত্র হিসেবে কাহিনিতে এসেছেন মালতী, লক্ষ্মী ও মিলি|নাট্যকার মূলত পুরুষতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থার একটি বাস্তব চিত্র এই নাটকটি মাধ্যমে ফুটিয়ে তুলেছেন। আর তা করতে গিয়ে তিনি সমাজের নারী-পুরুষের চিরাচরিত বৈষম্যের দিকটিকেই এই নাটকের মধ্যে প্রাধান্য দিয়েছেন।এ ছাড়া এই নাটকটিতে তিনি রোমান্টিক প্রেমের মিথকে বিনির্মাণ করেছেন|এর ফলে রামায়ণ ওবিভিন্ন

পৌরাণিক ঐতিহ্যের উপর ভিত্তি করে তিনি ভারতীয় নারীর প্রতিরূপ হিসেবে তাঁর নাটকের নারী চরিত্রগুলিকে নির্মাণ করেছেন। আর সীতা ও সাবিত্রীর রূপকে নির্মিত চরিত্রগুলির মাধ্যমে তিনি পৃথিবীর সমস্ত নারীদের নীরব ভুক্তভোগী হিসেবে চিহ্নিত করে তাঁর একটি ন্যায়সঙ্গত দৃষ্টিভঙ্গি পাঠকের সামনে তুলে ধরেছেন|

'পাগলা ঘোড়া' নাটকটি একটি মিষ্টি ভালোবাসার গল্প| এই ভালোবাসা হল প্রেমিকের জীবনের এক দুঃসাহসিক কাজ| কিন্তু প্রেমিকের জীবনে প্রেমে প্রত্যাখ্যান,ব্রেক-আপ এবং ব্রেক-আপের থেকে হতাশা—এই বিষয়গুলিই এই নাটকের প্রধান আশ্রয় হিসেবে গৃহীত হয়েছে| এ ছাড়া এই নাটকে পাগলা ঘোড়াকে প্রেমের প্রতীক হিসেবে চিত্রিত করা হয়েছে। তাই এই প্রেমের আকর্ষণে প্রেমিক খোশ মেজাজেই জীবনের ঝুঁকি নিতে প্রস্তুত হন|আধুনিক বাংলা কবিতাতেও এক সময় এ রকম প্রেমকে অনিয়ন্ত্রিত পাগলা ঘোড়ার সঙ্গে তুলনা করা হয়েছিল|প্রেম হল প্রেমিকের মনের সুতীব্র অনুভূতির প্রকাশ। কিন্তু তীব্র প্রেমে প্রেমিক-প্রেমিকার আন্তরিক ভালোবাসা বন্যতা পায়যা প্রেমিক-প্রেমিকাকে অনেক সময় তাঁদের নিয়ন্ত্রণের মধ্যে আবদ্ধ থাকতে দেয় না| আবার অন্যদিকে প্রকৃত প্রেমের উপহার পেতে হলে সেখানে প্রেমিককে দুঃসাহসী হওয়ার মতো ঘটনাগুলিও তাঁর জীবনে অনিবার্য হয়ে পড়ে। আবার জীবনের ঝুঁকি নিয়ে সমাজের পুরোনো নিয়ম ভাঙার পাশাপাশি প্রেমিক-প্রেমিকার মধ্যে এক বাঁধনছেঁড়া টান অনুভব করার ব্যাপারটিকেও প্রকৃত প্রেমের আর একটি অন্যতম দিক হিসেবে গণ্য করা হয়| এই প্রেম মানুষের মানসিক ও শারীরিক সমস্ত রকম বন্ধনকে দৃঢ় করে-- যুগ যুগ ধরে এইবিষয়টি সমাজের চোখে স্থির, নিশ্চিত ও চিরন্তন বলেই স্বীকৃত হয়ে এসেছে| বাদল সরকার সমসাময়িক সমাজ জীবনের বাস্তবতা হিসেবে সমাজের মধ্যবিত্ত পুরুষ ও নারীর জীবনের মূলগত বৈষম্যের দিকগুলিকে এই নাটকের মাধ্যমে তুলে ধরেছেন|

'পাগলা ঘোড়া' নাটকটি বিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধের এক বিশেষ সামাজিক অবস্থার নাটক| পৃথিবীর ইতিহাস লক্ষ করলে দেখা যায়যে, সারা বিশ্বেই বিত্তের শ্রেণিবিভাগ রয়েছে এবং চিরকাল মধ্যবিত্ত সমাজের পুরুষ ও মহিলারাই তার শিকার হয়ে এসেছেন| এই মধ্যবিত্ত শ্রেণির মানুষ কোনও দিনই সমাজের উচ্চবিত্তমানুষদের মতো বিলাসি জীবন-যাপন উপভোগ করতে পারেননা| আবার অন্যদিকে সমাজের নিম্নবিত্ত মানুষদের জীবনের যে তিক্ততা ও দুঃখ-কষ্ট রয়েছে--তা-ও এঁদের ভোগ করতে হয় না|ফলে এই মধ্যবিত্ত শ্রেণির মানুষরা ছিলেন চিরকালই নৈতিকভাবে সচেতন|তাই তাঁরা সামাজিক রীতিনীতি এবং মূল্যবোধের ফাঁসে আটকা পড়ে নিজের সমস্ত আশা-আকাঙ্ক্ষা জলাঞ্জলি দিয়ে অনেক সময় এক বিপন্ন ও অসহায় জীবন যাপন করতে বাধ্য হন। সমাজে নিজেদের সম্মান বজায় রাখার জন্য তাঁরা কখনও কখনও সমাজের চাপের কাছেমাথা নত করতে বাধ্য হন কিংবা আত্মহত্যা করতে ইচ্ছুক হন|কারণ তাঁরা জানেন যে,সমাজের মধ্যবিত্ত শ্রেণির মানুষদের এভাবেই চলতে হয়, এটিইতাঁদের জীবনের ঘোর বাস্তবতা।

সাহিত্যকে চিরকাল সমাজের দর্পণ হিসেবে স্বীকার করা হয়েছে|দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের ভয়াবহ অভিঘাতে বিপন্ন মানুষের অস্তিত্ব রক্ষার গুরুত্বপূর্ণ দিকগুলিকে অবলম্বন করে বাদল সরকার এই নাটকের মাধ্যমে সমকালের বিভিন্ন সামাজিক সমস্যা, সাংস্কৃতিক সংকট, অর্থনৈতিক অবস্থা ও রাজনৈতিক পরিস্থিতিকে বাস্তবসম্মতভাবে পাঠক বা দর্শকদের সামনে তুলে ধরেছেন। 'পাগলা ঘোড়া' নাটকটিতে প্রেমিকের প্রেয়সিকে প্রত্যাখ্যান করার ঘটনার মধ্য দিয়ে সরাসরি পুরুষতান্ত্রিক মনোভাবের দিকে আঙুল তুলেছেন। এই নাটকের শশী ও মালতীর সম্পর্ক বিশ্লেষণ করতে গিয়ে এই ব্যাপারটি প্রত্যক্ষ করা যায়।তা ছাড়া নিজের অনুভূতির সাথে সমাজের টানাপোড়েন এবং সামাজিক বিধি-নিষেধের সাথে একমত না হওয়ার জন্যএই নাটকে সাতু ও লক্ষ্মীর মধ্যে সম্পর্কের যে বিন্যাস ঘটেছে--তাতে নিজেদের সম্পর্কে সিদ্ধান্ত নিতে গিয়ে তাঁরা দ্বিধায় ভুগেছেন|আবার মিলি ও হিমাদ্রির সম্পর্কের মধ্যে তীব্র ভালোবাসাকে প্রত্যাখ্যান করার ঘটনার মধ্য দিয়ে হিমাদ্রির ভীতু মনের পরিচয় ফুটে উঠেছে|আর নারীদের মধ্যেও যে পুরুষের মতো সাহসের অভাবের

কথাও এই নাটকে ফুটে উঠেছে।কিন্তু তা সত্ত্বেও তাঁদের ভালোবাসার তীব্রতা নাটকে পাগলা ঘোড়া-র রূপক লাভ করেছে। এই নাটকে তাই উন্মাদনা যুক্তিকে ছাপিয়ে গেছে এবং এই নাটকের মধ্যে শেষ পর্যন্ত চরিত্রের মুখুমিই প্রধান বিষয় হয়ে উঠেছে। ফলে উদ্ভট নাটক হিসেবে ‘পাগলা ঘোড়া’ নাটকটির কৌশল, থিম ও ভাষাএকে অপরের পরিপূরক হয়ে উঠেছে|

এই নাটকের মৃত মেয়েটি এক সময় জীবনে সত্যিকারের ভালোবাসার সন্ধান করেছিলেন| মেয়েটি বলেছিলেন—

“মেয়েটা: (হাসতে হাসতে) আমি কী! আমি কে! কী বৃত্তান্ত! তোমরা জানো না? তোমরা জানো না কেউ? আমি কী? আমি কে? কী বৃত্তান্ত?” ১

কার্তিক ছোটবেলা থেকেই এই মেয়েটিকে ভালোবাসতেন। এক সময়এই মেয়েটি ভালোবাসার দাবি নিয়ে তাঁর কাছে যান কিন্তু তিনি তাঁকে ফিরিয়ে দেন। এর পর মেয়েটি তাঁর কাছে সাত দিন সময় চান। কিন্তু এরই মধ্যে তাঁকে অস্বীকার করার ঘটনা তাঁকে মৃত্যুর দিকে ঠেলে দেয়--মেয়েটি আত্মহত্যা করেন। কোনও নারী পুরুষের কাছে কিছু দাবি করলে তাঁকে যে এ ভাবে নিরাশ হতে হয়--তা যেন এই মেয়েটি ভাবতেই পারেননি| নারীর সামাজিক বুদ্ধির প্রান্তিকতা এই ঘটনার মধ্য দিয়ে নাট্যকার প্রকাশ করতে চেয়েছেন।সমাজে একমাত্র পুরুষকে মানুষ হিসেবে গণ্য করা হয় এবং একজন নারীকে সমাজ দেখতে চায় শুধু একজন নারী হিসেবে| কিন্তুএই নারীযখন একজন মানুষ হিসেবে আচরণ করেন,ঠিক তখনই তাঁকে অনুসরণ করতে বলা হয় পুরুষকে—আর এর ফলে শেষ পর্যন্ত তিনি অস্তিত্বের সঙ্কটে পড়েন| বাদল সরকার জীবনযুদ্ধে লড়াই করা নারীদের প্রতি সংবেদনশীল মনোভাব নিয়েতাঁদের পক্ষ অবলম্বন করেছেন।

আবার এই মেয়েটি নাটকের অন্য আর একটি জায়গায় বলেছেন—

“মেয়েটা : গল্প? কার গল্প নেই? কার রহস্য নেই? তোমরা? তোমাদের গল্প নেই? তোমাদের রহস্য নেই? বার করে নিয়ে এসো না গল্পগুলো! তোমাদের সব গল্পগুলো|দেখবে সব গল্প মিলেমিশে একাক্কার হয়ে গেছে। তোমাদের গল্প,আমাদের গল্প—সব---মিলেমিশে একাক্কার--” ২

অর্থাৎ জীবনের প্রতিটি মুহূর্তে এই নাটকের নারী চরিত্রগুলিকে এক কঠিন লড়াইয়ের মধ্য দিয়ে অগ্রসর হতে হয়েছে| বাদল সরকার তাঁর সহজ আন্তরিকতায় এই লড়াকু নারীদের জীবনকে তাঁর ‘পাগলা ঘোড়া’ নাটকেতুলে ধরেছেন। এ ছাড়া শহুরে মানুষদের মধ্যেও উচ্চাকাঙ্ক্ষা কীভাবে ক্রমশ ধীরে ধীরে বন্ধ হয়ে যায় এবং তাঁদের বিপন্ন করে তোলে—তাতিনি এই নাটকের মধ্যে দেখানোর চেষ্টা করেছেন|ফলে তাঁর নাটকগুলিতে জীবন সম্পর্কে একটি সহজ বিশ্বাস বারবার উঠে এসেছে যে, মানুষ একটি মাত্র জীবন পেয়েছে; তাঁর জীবনের চারপাশ কুয়াশায় আচ্ছন্ন হয়ে আছে| তবুও তাঁকে সামনের দিকে হাঁটতে হবে এবংজীবন যুদ্ধে জয়ী হতে হবে|মানুষের জীবনে দুঃখ আছে, সুখ আছে কিন্তু গভীর অন্ধকারের মধ্যেও তাঁকে আশার আলো জাগিয়ে তুলতে হবে--তা না হলে মৃত্যু তাঁর জীবনে জায়গা করে নেবে| আর মৃত্যুর অর্থ হল জীবনের অস্তিত্বকে অস্বীকার করা|

‘পাগলা ঘোড়া’ নাটকটি চারজন পুরুষের মধ্যে কথোপকথনের মধ্য দিয়ে শুরু হয়। এই চারজন পুরুষ শ্মশানে একটি মেয়ের শবদেহ দাহ করতে এসেছেন। মৃত মেয়েটির অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া যেখানে চলছিল সেখানে তাঁরা মদের আড্ডায় তাস খেলতে ব্যস্ত ছিলেন| কার্তিক, শশী, সাতু ও হিমাদ্রি প্রত্যেকেই সেই সময় বিভিন্ন বিষয় নিয়ে আলাপ-আলোচনা করছিলেন; অন্যদিকে সেই মৃত মেয়েটির অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া চলছিল|মৃত মেয়েটির মৃত্যুর রহস্য আলোচনা করার সময়হঠাৎ করে সেই মৃত মেয়েটি একজন রহস্যময়ী নারী হিসেবে সেখানে উপস্থিত হন| সেসময় এঁরা চারজন মিলে মালতী, লক্ষ্মী ও মিলি-র মৃত্যুর

প্রসঙ্গ নিয়েও আলোচনা করছিলেন। কারণ এক সময় শশী, সতু ও হিমাদ্রি এঁদেরকে পরিত্যাগ করার জন্যই এঁরা সকলেই আত্মহত্যা করেছেন। যেমন, সাতু হিমাদ্রিকে বলেছেন—

"যদি বলেন পুত্রার্থে ক্রিয়তে ভার্যা—তবে অবশ্য আলাদা। কিন্তু বংশরক্ষার ব্যাপারে কোনোদিন বিন্দুমাত্র মাথাব্যথা বোধ করিনি, কী করব বলুন?" [৩]

অর্থাৎ পুরুষের পুরুষতান্ত্রিক মনোভাবের জন্য এই নাটকের প্রত্যেকটি নারীর জীবনএক ভয়াবহ ও করুণ পরিণতি লাভ করেছে। তাই এই মৃত মেয়েটির অদম্য আত্মা এঁদের প্রত্যেককেই তাঁদের অতীত জীবন সম্পর্কে ভাবতে বাধ্য করেছিলেন। যেমন, শশীবাবুর ছটফট করে বেড়ানোর প্রসঙ্গে মেয়েটি বলেছেন—

"মেয়েটা: পা নয়, পা নয়—মাথা। মাথা ধরে গেছে। ধরবে না মাথা ভিতরে কতো কী রয়েছে, কতকী ঘুরছে নাগর দোলার চরকি পাকের মতো। বনবন বনবন করে ঘুরছে, বোঝা যাচ্ছে না চেনা যাচ্ছে না, ছায়াবাজির মতো—বনবন বনবন করেঘুরছে---

শশী: (স্পষ্ট উচ্চারণে, কিন্তু অনেকটা আপন মনে) মালতী।

মেয়েটা: মালতী? মালতী ক--বে মরে ভূত হয়ে গেছে। আমার মতো। পুড়ে ছাই ছাই হয়ে গেছে, ঠিক ওই রকম (পেছনে আঙুল দেখিয়ে)--- অমনি ধু ধু আগুনে, আমার মতো।" [৪]

নাটকের শশী, সাতু, কার্তিক ও হিমাদ্রি মেয়েটিকে নিয়ে গল্পের আবহে এক সময় নিজেদের মশগুল করে রেখেছিলেন।কারণ শ্মশানেই তো রসালো গল্প জমে ভালো! শশী তাঁর অতীত জীবনের হারিয়ে যাওয়া প্রেমের গল্পের এক একটি করে গিট খুলেছিলেন।কিন্তু তিনি শেষে অনুতপ্ত হন যখন কার্তিক, সাতুও হিমাদ্রি তাঁর কাছে জানতে চান যে, তিনি কী করতেন যদি তাঁর ভালোবাসার পাত্রীকে তাঁর কোনও ঘনিষ্ঠ বন্ধু বিয়ে করতে চান? শশী তাঁর ভালোবাসার পাত্রীকে পরিত্যাগ করেছিলেন; প্রদীপের সঙ্গে পরে তাঁর বিয়ে হয়।কিন্তু বিয়ের পর প্রদীপ মালতীকে গরম ছুরি দিয়ে মারধর করেছিলেন। কারণ তিনি জানতে পেরেছিলেন যে,মেয়েটি শশীর প্রেমে পড়েছিলেন। পরবর্তীকালে বন্ধুর নিষ্ঠুরতার প্রমাণ দেখানোর জন্য মালতী শশীর সঙ্গে দেখা করতে আসেন। অন্যদিকে শশীও মালতীকে তাঁর জীবনে গ্রহণ করার সাহস দেখাতে পারেন না।অস্তিত্বের সঙ্কটে বিপন্ন মালতী তাই এক বছরের মধ্যে আত্মহত্যা করলেন।যেমন, শশীর সঙ্গে মালতীর কথোপকথনের কিছু অংশ---

"মালতী :(কঠিন কণ্ঠে) হ্যাঁ, চলেই যাব। আমি জানতাম, তুমি চলে যেতেই বলবে। তোমার জিতের আত্মপ্রসাদ তুমি ছাড়তে পারবে না।

[শশী কী বলতে গেলো, কিন্তু মালতী বলতে দিলো না। এগিয়ে এলো জ্বালাধরা চোখ শশীর চোখে রেখে।]

যাবার আগে শুধু তোমাকে জানিয়ে যাবো- কেন এসেছিলাম। [মালতী জামার সব চেয়ে নিচের বোতামটা খুলতে লাগলো।]

শশী : (স্তম্ভিতভাবে) এ কী করছো মালতী ?

[দপ করে মঞ্চের সব আলো নিভে গেলো। মেয়েটার অর্ধোন্মাদ খিলখিল হাসি শুধু অন্ধকার চিরে। ঘরের আলো জ্বললো। শশী আগের মতো জানলায়। মেয়েটানেই।]" [৫]

'পাগলা ঘোড়া' নাটককে হিমাদ্রি এক সময় কার্তিকের জীবনের অতীত টেনে বের করে এনেছেন। হিমাদ্রি পেশায় একজন শিক্ষক;তিনিও মিলির ভাইয়ের ব্যক্তিগত শিক্ষকের চাকরি করতে গিয়ে এক সময় মিলির প্রেমে পড়েন।কিন্তু পরবর্তীকালে তিনি মিলির মতো সমাজের উচ্চবিত্ত মানুষদের আচরণ ঠিকমতো বুঝতে না পারার জন্য একদিন মিলির ভাইকে পড়ানোর চাকরি ছেড়ে দেন। এর ফলে মিলি হতবাক হয়ে যান এবং চরম হতাশাগ্রস্ত অবস্থায় তিনিও আত্মহত্যা করেন। হিমাদ্রির সঙ্গে কথোপকথনে মিলির সেই হতাশাগ্রস্ত মনের পরিচয় ফুটে উঠেছে। যেমন---

"মিলি : (শূন্যকণ্ঠে) তুমি যে আমাকে একেবারে সহ্য করতে পারো না।

হিমাদ্রি : তা নয় মিলি, তুমি জানো তা নয়। আমি চেষ্টার ত্রুটি করিনি--

মিলি : চেষ্টা? তুমি চেষ্টা করেছো আমাকে একেবারে ঢেলে সাজাতে। তুমি চেয়েছো আমি তোমার জগতে একেবারে মাপে মাপে মিলে যাই। এক চুল এদিক ওদিক হলে আমাকে দূর করে দিয়েছো--

হিমাদ্রি: মিলি!

মিলি :কুকুরের মতো দূর করে দিয়েছো। আমি কুকুরের মত আবার তোমার কাছে ফিরে যাবার চেষ্টা করেছি—বারবার-- ভিক্ষে করেছি-- অথচ তুমি আমার জগৎটাকে একফোঁটা বোঝবার চেষ্টা করলে না।

হিমাদ্রি : করিনি?

মিলি : একফোঁটা সহ্য করলে না, ক্ষমা করলে না। কেন করবে? তুমি তো আমাকে ভালোবাসোনি কোনোদিন?[৬]

বাদল সরকার তাঁর'পাগলা ঘোড়া' নাটকটিতে দেখিয়েছেন যে, এই নাটকটির মেয়ে চরিত্রগুলি অর্থাৎ মালতী, লক্ষ্মী ও মিলি প্রত্যেকেই তাঁদের প্রেমিকদের বঞ্চনার শিকার হয়ে চরম হতাশায় ভুগেছেন। কারণ শশী বিসর্জন দিয়েছিলেন মালতীকে, হিমাদ্রি প্রত্যাখ্যান করেছিলেন মিলিকে এবং সাতু বিসর্জন দিয়েছিলেন লক্ষ্মীকে।এই নাটকের মেয়েদের জীবনে ঘটে যাওয়া এ রকম কিছু অপ্রত্যাশিত পরিস্থিতি এই নাটকের নারী চরিত্রগুলিকে তাঁদের জীবন সম্পর্কে এক ভয়ঙ্কর সিদ্ধান্ত গ্রহণের দিকে টেনে নিয়ে গেছে। যেমন, লছমি বলেছেন--

"তোমাকে ছেড়ে যাবো—মরলে। আর--তুমি তাড়িয়ে দিলে।

সাতু : কোনটারই চান্স দেখছিনা বিশেষ। দিব্যি তাগড়া আছিস, চট করে মরবি না। আর তোকে তাড়িয়ে দিলে আর কি আমার চলবে?

লছমি : ভুলুয়া! ভুলু ভুলু ভুলুয়া!"[৭]

কারণ যেসমস্ত খারাপ কাজের জন্য মানুষ নিজেকে দায়ী মনে করেনতার মধ্যে কোনও কিছুইএর চাইতে বেশি অপমানজনক নয়। তাই তাঁরা প্রত্যেকেই এক গভীর মানসিক সঙ্কটের তাড়নায় আত্মহত্যা করেছেন।

এই নাটকের একটি অপরিহার্য উপাদান হল দ্বন্দ্ব;চরিত্রের আন্তঃব্যক্তিক দ্বন্দ্ব এই নাটকের মধ্যে আক্ষরিকভাবে প্রকাশিত হয়েছে।এই নাটকে শশী ও মালতী, হিমাদ্রি ও মিলি, সাতুও লক্ষ্মী প্রভৃতি চরিত্রের মধ্য দিয়েচরিত্রগুলির আন্তঃব্যক্তিক দ্বন্দ্ব প্রকাশ পেয়েছে। এই নাটকটি যেন একটি প্রতীক-নাটক।

আমাদের সামনে যে চারজন পুরুষ মিলে একত্রিত হয়েছেন একটি মেয়ের অন্ত্যেষ্টিক্রিয়াকে কেন্দ্র করে--তাঁরা একে অপরের সঙ্গেপরিচিত| তাঁরা সেসময় বিনামূল্যে প্রাপ্ত কিছু পানীয় উপভোগ করছিলেন এবং এক একটি করে তাঁদের হৃদয়হীনতার গল্প করছিলেন; তাঁরা প্রত্যেকইতাঁদের জীবনের এক-একটি করে গল্পের গিট উন্মোচন করছিলেন| যেমন--

“মেয়েটা : হ্যাঁগো, মালতী। মালতীর মড়াপোড়াতে গিয়েছিলে, মনে নেই? তুমি, তোমার সেই গুণধর বন্ধু--প্রদীপ না দীপক কী যেন নামটা?

শশী : প্রদীপ|

মেয়েটা :হ্যাঁ, প্রদীপ| বেশ বাহারি নাম| আরো কে কে যেন ছিল সব--শ্মশানবন্ধুর দল| মনে নেই?

শশী : প্রদীপ! শয়তান!

মেয়েটা : (হেঁসে উঠে) হ্যাঁ ঠিক! শয়তান! শয়তান নয়?ওর জন্যেই তো মালতী-

শশী : (ঘুরে দাঁড়িয়ে) মালতী!

মালতী : না| না না না-—

শশী : মালতী শোনো—

মালতী : না না—

শশী : শোনো মালতী! শোনো! এ ছাড়া—

মালতী :না না, আমি পারবো না! আমি পারবো না!

শশী : (ওর কথার উপরেই) এ ছাড়া আর কোনো উপায় নেই মালতী, কোনো রাস্তা নেই!

মালতী :আমি পারবো না! এখন আমি কিছুতেই পারবো না!

শশী : এই একমাত্র পথ মালতী, আর কোনো রাস্তায় নেই--

মালতী: এখন আমি পারবো না! এখন আর আমি কিছুতেই— কিছুতেই—

শশী : কিন্তু মালতী, তুমি যদি প্রদীপকে বিয়ে না করো--

মালতি : (আর্তস্বরে) না না, বোলো না! বোলো না! এখন সে আর কিছুতেই হয় না—

কিছুতেই— [৮]

‘পাগলা ঘোড়া’ নাটকটির প্রত্যেকটি চরিত্রেরই এক একটি অতীত স্মৃতির জগৎ আছে--যা শেষ পর্যন্তএই নাটকটিতে সমাহিত হয়ে গেছে| পাগলা ঘোড়া প্রতীকটি আসলে মৃত মেয়েটির অর্থাৎ নারীর চিরন্তন শোষণের প্রতীক হিসেবে এই নাটকে ব্যবহৃত হয়েছে| আর ‘মেয়েটি’ শব্দটি একটি সাধারণ অর্থে এবং একটি বিশিষ্ট যৌথ অর্থে পাঠকের কাছে প্রকাশিত হয়েছে| তিনি সমাজের সকল নারীর প্রতিনিধি--যাঁরা অত্যাচারিত,অপমানিত, নির্যাতিত ও যন্ত্রণাকাতর অবস্থায় সমাজে বিপন্ন জীবন-যাপন করতে বাধ্য হন|বাদল সরকার এখানে অত্যন্ত সুন্দরভাবে মালতীর দুর্বিসহ সামাজিক সমস্যার চিত্র এঁকেছেন। লক্ষ্মীর কান্না এই নাটকের চারজন পুরুষের সঙ্গে তাঁর গভীর সম্পর্কের কথা তুলে ধরেছে| আর শ্মশানে মৃতদেহ পোড়ানোর প্রতীকটির মধ্য দিয়ে নাট্যকার চরিত্রগুলির অভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্ব ও যন্ত্রণাকে পাঠকের সামনে তুলে ধরেছেন। ‘পাগলা ঘোড়া’ নাটকটির চরিত্রগুলি তাই সম্পূর্ণ প্রেমের গল্প ও সম্পর্কের কথা

বলেছেন। 'পাগলা ঘোড়া' নামটি অত্যন্ত চালাকি করে ব্যবহার করে নাট্যকার সমসাময়িক সামাজিক পরিস্থিতি,অর্থনৈতিক অবস্থা এবং মৃত্যু-পরবর্তী জীবনকে আধুনিক জীবন ও মনোভাবে সৃজন করার মধ্য দিয়ে এক উদ্ভট ও অস্থির মানব মনের প্রতিফলন ঘটিয়েছেন।

তথ্যসূত্র :

১) সরকার, বাদল: *নাটক সমগ্র (২য় খণ্ড),* মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রা: লি:, কলকাতা, ১৪১৭, পৃ. ৩৮২।

২) প্রাগুক্ত, প্রথম অঙ্ক, পৃ. ৩৮৩।

৩) প্রাগুক্ত, প্রথম অঙ্ক, পৃ. ৩৮৭।

৪) প্রাগুক্ত, প্রথম অঙ্ক, পৃ. ৩৮৭।

৫) প্রাগুক্ত, প্রথম অঙ্ক, পৃ. ৩৮৯।

৬) প্রাগুক্ত, প্রথম অঙ্ক, পৃ. ৪২২।

৭) প্রাগুক্ত, প্রথম অঙ্ক, পৃ. ৪২৬।

৮) প্রাগুক্ত, প্রথম অঙ্ক, পৃ. ৩৯২।

গ্রন্থপঞ্জি

১) সরকার, বাদল: *নাটক সমগ্র (২য় খণ্ড)*, মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রা: লি:, কলকাতা,১৪১৭ (বাং.)।

২) ঘোষ, অজিতকুমার: *বাংলা নাটকের ইতিহাস,* দে'জ পাবলিশিং,কলকাতা,২০০৫।

৩) চৌধুরী, দর্শন: *নাট্য ব্যক্তিত্ব বাদল সরকার,* একুশ শতক,কলকাতা, ২০০৯।

৪) চৌধুরী,সুবল কান্তি ও কর, ভবানী (সম্পা.): *বাংলা অ্যাবসার্ড নাটক,* সোপান, কলকাতা,২০২০।

৫) ভট্টাচার্য,আশুতোষ: *বাংলা নাট্যসাহিত্যের ইতিহাস (২য় খণ্ড),* এ. মুখার্জী অ্যান্ড কোং প্রাইভেট লিমিটেড,কলকাতা,চতুর্থ সংস্করণ, মে ২০০৩।

৬) ভট্টাচার্য, সাধনকুমার: *নাট্যতত্ত্ব মীমাংসা,* করুণা প্রকাশনী, কলকাতা,১৯৬৩।

৭) মজুমদার, উজ্জ্বলকুমার: *সাহিত্য ও সমালোচনার রূপ-রীতি,* দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা,২০০৩।

৮) সরকার, বাদল: *পুরোনো কাসুন্দি (১ম, ২য়, ৩য় খণ্ড)*, লেখনী প্রকাশনী,কলকাতা, ২০০৬।

৯) দত্ত, দত্তাত্রেয়: "দি অ্যাবসার্ড: নাটকে উদ্ভটতত্ত্ব", *পাশ্চাত্য সাহিত্যতত্ত্ব ও সাহিত্যভাবনা,* নবেন্দুসেন (সম্পা.), রত্নাবলী,কলকাতা,২০০৯।